ভার্সিটির দিনগুলিতে-২

অদ্বিতীয়া

সাজিদ হাসান

হসন্ত প্রকাশন

উৎসর্গ

সেইসব অদ্বিতীয়া, অপরাজিতাদের, ঘুণে ধরা সমাজ, রাষ্ট্রের সকল বাধাবিপত্তি ব্যর্থ করে আলোর পথে যারা এগিয়ে চলেছে দৃপ্ত পদক্ষেপে। উম্মাহাতুল মুমিনিনদের উত্তরসূরি সেই দৃঢ়পদ মানবীদের প্রতি রইল লক্ষ-কোটি সালাম।

লেখকের কথা

ছেলেদের জন্য ভার্সিটি লাইফের বই 'আকাশ ছোঁয়ার কাল' যখন শেষ করি, তখনই মাথায় ছিল, বোনদের জন্য একটা কিছু লেখা উচিত। যে বইটা কেবল সাহিত্যই হবে না, হবে তার চেয়ে বেশি কিছু। তাতে জীবনের গল্প থাকবে, থাকবে হাসি-কান্নার কথা, থাকবে হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র। যার পাতায় পাতায় 'যুগশ্রেষ্ঠা' মানুষগুলোর দিনলিপি উঠে আসবে। ব্যাপারটা কষ্টকর হবে জানতাম, কিন্তু আমি আশাহত হইনি। যে কাজে চ্যালেঞ্জ যত বড়, তার সফলতায় আমার ততটাই তৃপ্তি।

জীবনের বড় একটা অংশ যার কেটেছে গোনাহের সাগরে—নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি—সেই কেবল জানে ভুল পথ ছেড়ে আলোর মিনার লক্ষ্য করে ভবিষ্যতের দিকপরিবর্তন করা কত কঠিন। আর যারা দাঁতে দাঁত চেপে অটল থাকে স্বীয় বিশ্বাস, কর্মে, তাদের দুর্ভোগও কিছু কম নয়। কিন্তু, কেন যেন এই মানুষগুলোর সংগ্রামের কথা খুব একটা বলা হয় না। নব্বই শতাংশ মুসলিমের দেশ বলে আমরা আত্মতৃপ্তি লাভ করি বলে? হয়তো তাই হবে।

তাই, সেইসব মানুষ—যাদের জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে চলমান এক বিশ্বযুদ্ধের মতো সঙ্গিন, গোলাপের ডালের চেয়েও কণ্টকাকীর্ণ, সেই অনন্যাদের গভীর রাতের অব্যক্ত যাতনা আর বুক ফেটে যাওয়া চাপা কথামালাই 'অদ্বিতীয়া' বইটির হৃৎপিণ্ড।

এ ছাড়াও আরও কিছু ঘটনা আপনার সামনে আসবে, যেগুলোর সারমর্ম আমি আপনাকে শুরুতেই বলে দেবো না, তাতে বই পড়ার মজাটাই আপনি অর্ধেক হারিয়ে ফেলবেন। পড়তে পড়তে আপনি নিজেই ভেবে বের করুন না, কেন এমন হলো। যদি না বলা সে কথাগুলো আপনি অনুধাবন করতে পারেন,

নিজের জীবনের সাথে মেলাতে পারেন, তাহলে আমি নিজেকে সফল ভাবব, ইনশাআল্লাহ।

‘অদ্বিতীয়াদের’ পথচলা হয়তো এখানেই শেষ নয়। ‘অপরাজিতাদের’ হাত ধরে তারা হয়তো আবারও এগিয়ে যাবে সত্যের রাজপথে। সে স্বপ্ন বাস্তব হবে কি না কে জানে। সেই মহান রবের দরবার থেকে অনুমতি আসার অপেক্ষায় রইলাম। ওহ হ্যাঁ, আরেকটা কথা। আপনিই যদি সেই অদ্বিতীয়া হয়ে থাকেন, তাহলে শুনে রাখুন। যত ঝড়ঝাপটাই আসুক না কেন, অপরাজিতার হাত ছাড়বেন না কিন্তু!

তাহলে, আজ এ পর্যন্তই থাকুক। ‘অদ্বিতীয়া’র সঙ্গে আপনার পথচলা কল্যাণকর হোক। এই দোয়ার সঙ্গে বিদায় নিচ্ছি, আমি অধম বান্দা সাজিদ, আসসালামু আলাইকুম।

১

চৈত্রের প্রথম দিন। উত্তপ্ত লু হাওয়া বয়ে চলেছে চারিদিকে। ঘড়িতে বিকেল চারটা বেজে ত্রিশ। ভার্সিটির ক্লাস শেষে উত্তরায় এসে সিএনজি থেকে নামল শোভা। পার্স থেকে ভাড়ার টাকা বের করে এগিয়ে দিলো ড্রাইভারকে। কিন্তু ড্রাইভার হাত গুটিয়ে নির্জীব কণ্ঠে বলল—আরও পঞ্চাশ টাকা লাগব আফা, রাস্তায় জ্যাম আছিল।

এসব ট্রিক্স শোভা বেশ ভালো করে জানে। ঢাকাতেই ওর জন্ম—এখানকার আলো-বাতাস আর 'বিশুদ্ধ' অক্সিজেন টেনে টেনে সে বড় হয়েছে। ভাড়া বাড়ানোর পুরোনো ট্রিক্স ওর সাথে চলবে না। শোভা টাকাটা ধরে রেখে বলল—নিলে নাও, নয়তো বসে থাকো। আমি গেলাম।

হাঁটা শুরু করতে মামা সুর নরম করে ডাক দিলো—খাড়ান আফা। কই যাইতাসেন। তারপর টাকাটা হাতে দিয়ে বাসার দিকে পা বাড়াতে শোভা স্পষ্ট শুনতে পেল, সিএনজিওয়ালা ওকে ইঙ্গিত করে কীসব অশ্লীল কথা বলছে। না শোনার ভান করে শোভা দ্রুত চলে এলো। ঢাকায় বসবাস করা মেয়েদের জন্য এমন অভিজ্ঞতা খুবই কমন। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় দু-চারজন একটু গা ছোঁবে, শিষ দেবে, কুৎসিত ইঙ্গিত করবে। সময়ের প্রবাহে প্রায় সবার গা সয়ে যায়, একটা সময় এসবে আর লজ্জা লাগে না, সবকিছুই তখন স্বাভাবিক মনে হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে শোভা তাদের পর্যায়ে এখনো উঠতে পারেনি। তাই যখনই এমন সিচুয়েশন হয়, একটুকরো আফসোস ওর বুকের মাঝে বিঁধে থাকা কাঁটার মতো চিনচিন করে ওঠে। আজ যদি ওর একটা ভাই থাকত—তাহলে এইসব অসভ্যদেরকে ও নির্ঘাত পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিত।

তিনতলায় দাঁড়িয়ে দুবার কলিং বেল চাপল শোভা। ভেতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই। ক্লান্তিতে, অবসন্নতায় ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। পাওয়ারের মোটা চশমাটা ঘোলা হয়ে আসছে। তৃতীয়বার কলিং বেলে আঙুল রাখতেই নোভা দরজা খুলে

তাকিয়ে, সবগুলো দাঁত বের করে হাসতে লাগল। বড় চিত্তাকর্ষক, হৃদয়গ্রাহী সে হাসি—প্রশান্ত মহাসাগরের অতল থেকে জানবাজ ডুবুরির তুলে আনা, গোলাপি আভায় মাখা শুভ্র মুক্তোমালাও তার কাছে পাত্তা পাবে না। ভেতরে যেতেই নোভা শোভাকে জড়িয়ে ধরে বলল—আপাইই! ক্লাস কেমন হলো রে আজ? খুব মজা হয়েছে, তাই না রে?

শোভা ওকে গা থেকে ছাড়াতে চাইল, প্রচণ্ড গরমে খুব হাঁসফাঁস লাগছে। কিন্তু নোভা আটকে রইল জিয়লের আঠা হয়ে।

—ছাড় তো মেজু, টায়ার্ড লাগছে খুব।

নোভার কান দিয়ে সে কথা গেছে বলে মনে হচ্ছে না। গা থেকে সরার বদলে এবারে জিয়লের আঠার মুখে কথা ফুটল—বল না আপাই, কেমন লাগল আজ? খুব চিলিং চিলিং ফিলিং, তাই না রে?

শেষে বিরক্ত হয়ে সে নোভাকে সহই পা ছেঁচড়ে ডাইনিং টেবিলের দিকে এগোয়। সে এক চমৎকার দৃশ্য। মেয়েটা মাঝে মাঝে এত ঢং করে! চেয়ারে বসে হাঁফ ছেড়ে শোভা দেখতে পায়—মেজু তার জন্য ফ্রিজের পানি দিয়ে কাঁচা আমের জুস বানিয়ে রেখেছে। এই মুহূর্তে আহ্লাদী মেয়েটা সামনের চেয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। সে চোখের পলক ফেলতে বুঝি অদৃশ্য থেকে কোনো গায়েবি নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। পলকহীন সে উৎসুক, শিশুসুলভ দৃষ্টির সামনে চেষ্টা করেও খানিক আগের বিরক্তিটা শোভা আর ধরে রাখতে পারল না। শোভা হেসে ফেলে ফিক করে, তারপর একটু চুমুক দিয়ে সেও হাসিহাসি মুখে গালে হাত রাখে। মুখে হাসি মেখে, মেজুর দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করতে থাকে। নোভা খিলখিল হাসিতে আবারও মুক্তো ঝরিয়ে বলে—বল না আপাই!

—জুসটা ভালো হয়েছে খুব। প্রভা, আম্মি খেয়েছে?

—না, ওদের কেন দিবো? আজ তোর স্পেশাল একটা দিন, সো আই মেইড ইট অনলি ফর ইউ।

জুসটা শেষ করে বেশ একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে সে। শোভা সবার বড়, ছোটরা আপাই আপাই বলতে পাগল। সবার ছোট প্রভা, ক্লাস সিক্সে পড়ে; ডাকনাম পিচ্চু। আর মেজোবোন নোভা। ওকে ডাকা হয় মেজু বলে; এবার ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। কিন্তু বয়সের তুলনায় মেয়েটা বোধ হয় একটু বেশিই ম্যাচিউরড। সে ভালো করেই জানত, ভার্সিটির ফার্স্ট-ডে শেষে এই কাঠফাটা রোদে বাসায় আসতে আসতে আপাইর স্ট্যামিনা ফুরিয়ে যাবে। মাঝে মাঝে মনে হয়, এত ভালো একটা বোন যে সে পেয়েছে, এ নির্ঘাত তার সাত রাজার ভাগ্য।

সেই সৌভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতেই শোভা আনমনে হেসে ফেলে। নোভা সন্দেহের গলায় বলে—হাসছিস কেন আপাই?

নোভার গাল ধরে টেনে আহ্লাদ করে জবাব দেয়—এমনিই রে মেজুউউ।

মেজু একটু মেকি রাগ দেখাতে শোভা আবার বলল—আচ্ছা, আচ্ছা বলছি। ক্লাস কেমন হয়েছে জানতে চাস?

—হ্যাঁ হ্যাঁ! মুক্তোঝরনার চোখে এবারে দীপ্তি ছড়ায় কোহিনুরের উজ্জ্বলতা।

—হয়েছে মোটামুটি। আজ দুজন স্যার আর একজন ম্যাম ক্লাস নিয়েছেন। এর মধ্যে লামিয়া ম্যাম আর সোহরাব স্যারের ক্লাস বেশ মজার ছিল।

—কেন? বাকি স্যারটা আবার কি করেছে? নোভা অবাক হয়।

শোভা মেজুর চোখের দিকে ভালো করে তাকায়; সেখানে তারার মতো মিটমিট করছে রাজ্যের আগ্রহ। ছোট থেকেই সকলকিছুতে নোভার প্রচুর কৌতূহল। বাবা-মা ভেবেছিল, বড় হলে বুঝি সময়ের চক্রে পড়ে তার আতিশয্যে একসময় ভাটা পড়বে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, কৌতূহলের গাছটা বেঁটে না হয়ে বরং আকাশমণির মতো লকলক করে কেবল ঊর্ধ্বাকাশের দিকে এগোচ্ছে। নোভার গাল টেনে আবারও নাকি সুরে শোভা বলে—দাঁড়া, আগে কাপড় ছেড়ে নিই। ঘেমে কী বিচ্ছিরি অবস্থা, ছিইইইই!

ফ্রেশ হয়ে এলে দু-বোন বারান্দার দোলনাতে গিয়ে বসে। ঢাকার ব্যস্ত এলাকার ফ্ল্যাট, বড় রুমের বাসার ভাড়া এদিকে অনেক বেশি। স্বাভাবিকভাবেই ওদের মিডিয়াম সাইজের ফ্ল্যাটের বারান্দাটা খুব ছোট। তবু সেই ক্ষুদ্র জায়গাজুড়ে তারা অবিশ্বাস্য দক্ষতায় অনেকগুলো ফুলগাছের জোয়ার ঘটিয়েছে। এই ছোট্ট বারান্দায় ওরা তিন বোন যে এতগুলো টব কীভাবে রেখেছে—সেটা আম্মিসহ কারোই মাথায় আসে না। তাই নতুন-পুরোনো, কাছের-দূরের—কোনো আগন্তুকই বাগানটার প্রশংসা করতে কখনো কার্পণ্য করে না।

বৃক্ষমেলার এ সজীব আয়োজনে নবীন এক সদস্যের ডালে ফুটে আছে টকটকে লাল দুটো গোলাপ। আরেকটা বড় কলি ফুটি ফুটি করছে—তাকালেই ইচ্ছে করে, মখমলের মতো ভারী পাপড়িগুলো আলতো করে ছুঁয়ে দিতে। হাসনাহেনার ডালে ফুলগুলো ঘুমিয়ে আছে; রাত হলেই ওরা জেগে উঠবে, আবেশী এক মাতাল সুবাসে পাগলপারা করে দেবে চারপাশ। পাশের ফ্ল্যাটের তমা আপি প্রতি রাতে কফির মগ হাতে তাদের বারান্দায় এসে দাঁড়ান, তারপর নিয়ম করে শোভাদের কাছে সে আবেশিত সৌরভের প্রশংসা করেন।

আর গন্ধরাজের নাম নিলে অন্য ফুলেদের স্তুতিবাক্যগুলোকে নিতান্ত অবহেলা বলে ভ্রম হবে, তাই সে কথা আজ থাকুক। পাপড়ির ঘ্রাণ আর রঙের মেলা ছাড়াও গ্রিলে ঝুলানো রয়েছে কতগুলো পাতাবাহার; কত বাহারি তাদের পাতাগুলো—লাল, নীল, হলুদ, মিশ্র। শোভাদের এই বাগানটা যতটা না শখের, তার চেয়েও বেশি যত্নের। তাই চোখের তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এ যে মনও ভুলাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

এতসব আয়োজনের মাঝেই একখানি দড়ির দোলনা সেখানে ঝুলে থাকে তিন বোনের অপেক্ষায়। বিকেল হলে ওরা সেখানে বসে হাওয়া খায়, অবসরে আড্ডা দেয় খাবারের বাটি হাতে। তারুণ্য আর কৈশোরের উচ্ছ্বসিত আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে ওদের ছোট্ট পৃথিবীটা।

দোলনায় দোল খেতে খেতে শোভা ঘটনার ডালি সাজিয়ে দেয় নোভার সামনে—কার্জনে ইয়া বড় এক হলরুমে আজ ক্লাস হলো আমাদের। ফিজিক্সে সবমিলিয়ে ১৪০ জন স্টুডেন্ট, তার মধ্যে মেয়ে আমরা মাত্র ৩০ জন। স্যাররা যখন মাইকে কথা আরম্ভ করল, পুরো রুম যেন গমগম করছিল।

একটু থেমে ও আবার বলা শুরু করে—তো মজার কথা শোন। আজকে ক্লাসে গিয়ে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা-পরিচয় হলো। প্রথম কথোপকথনে সবাইকে বেশ হাসিখুশি লাগলেও কে আসলে কেমন—সেটা বোঝা যাবে কদিন গেলে। তবে আনিকা নামের একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল রে। ওর বাসা শেরপুর জেলায়—সেখানে ইয়া বড় এক পাহাড়ের পাশে নাকি ওদের বাড়ি। মেয়েটা বলল, ওর ঘরের জানালা থেকে কখনো কখনো বুনো হরিণ-বানরের দলও নাকি দেখা যায়। একবার নাকি হাতিও এসেছিল একপাল! আমার তো শুনেই মন উথালপাতাল হয়ে যাচ্ছিল, ওদের বাড়িতে গিয়ে ঘুরে আসতে পারলে কী মজাটাই-না হতো!

আনিকার বাবা আবার ওদের এলাকার আলিয়া মাদরাসার শিক্ষক। বাড়িতে মা-বাবা, ছোট ভাই আর দাদি। ওর চোখ দুটি কী যে সুন্দর! আমার কী যে ইচ্ছে করছিল ওর মুখটা দেখতে!

শোভা একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—হাহ! কিন্তু কপাল খারাপ।

—কেন আপাই?!

—ওমা! সে মুখ ঢেকে রাখে না? হাতমোজাও পরে। এতগুলো ছেলের সামনে নিকাব খুলবে নাকি।

মেজু বিজ্ঞ পণ্ডিতের মতো মাথা ঝাঁকায়—ওহ! তাও তো কথা। তারপর আবার গালে

হাত রেখে বলে,

—তা শুধু একজনই? আর কোনো বান্ধবী পাওনি?

—বান্ধবী হবে কি না, সেটা এখনই বলা যাবে নাকি বোকা। তবে আরও একজনের সাথে জমে গেছে রে। মেয়েটার নাম সিরাজাম মুনিরা, ডাক নাম মুনা। সিটি কলেজে পড়েছে। টমবয় টমবয় একটা ভাব, হিহিহি। শার্ট-প্যান্ট পরে এসেছে ক্লাসে। ভেবেছিলাম আমাকে দেখে ভ্রু কুচকাবে। কিন্তু না; সহজভাবেই কথা বলল। দু-ক্লাস কথা বলেই কীভাবে যেন পানির মতো মিশে গেলাম।

নোভা গালে হাত দিয়ে আপাইর কথা শুনছিল। আজ সকালে আপাইকে সে কত করে অনুরোধ করেছে—তাকেও সাথে করে নিতে। বিনিময়ে সে তার টিম্মিকে নিয়ে ঘুমানোর পারমিশনও আপাইকে দিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু আপাই শুনলই না। শোভা যে এক স্যারকে ভালো না লাগার কারণ বেমালুম চেপে গেছে—এই আফসোসে সেটাও সে ধরতে পারল না। এখন ক্লাসের নয়া বান্ধবীদের গল্প শুনে ওর দুঃখ আরও বেড়ে যাচ্ছে। দোলনা ছেড়ে নোভা ওর গলায় জড়িয়ে আহ্লাদী কণ্ঠে বলল—আপাই, কালকে আমায় তোর সাথে করে নে না! আমার খুব শখ ভার্সিটিতে একদিন ক্লাস করার। শুধু এই শখটা তুই পূরণ করে দে।

শোভা বাঁকা নজরে তাকাল ওর দিকে। নোভার চোখদুটো অসহায় বিড়ালছানার মতো টলোমলো করছে। মেয়েটা এত ন্যাকামি কোত্থেকে যে শিখেছে! ওর ন্যাকামির ব্যাপারে শোভার আজই প্রথম অভিজ্ঞতা হলে দাবিটা যদি চাঁদও হতো, তবে তাই জোগাড় করার মরণপণ সংগ্রামে সে নেমে পড়ত; এমনই তার আদিখ্যেতার মায়া। কিন্তু মেজুর আবদারের ঝুলির সব জাদুর ছল তার জানা। সে সুন্দর করে হাত দুটো গলা থেকে ছাড়িয়ে হেসে বলল—জি নেহি বেহেনজি। তা হচ্ছে না। আপনার সাথে আমার এমন কোনো ডিল হয়নি, আর হবেও না। সো নো হাংকি পাংকি—ডোন্ট বি লাইক এ নটি মাংকি। আপনি থাকেন, আমি গিয়ে একটু ঘুমাই।

নোভা আপাইকে পেছন থেকে অসহায়ের মতো জড়িয়ে আটকানোর চেষ্টা করল। শোভাও পুরোনো খেলোয়াড়; শিং মাছের মতো পিছলে, বাঁধন ছেড়ে সে বেরিয়ে গেল নিপুণ দক্ষতায়। দোলনা থেকে নোভার কাঁদো কাঁদো গলায় আবদার শোনা যাচ্ছে—আপাই! আপাই! প্লিজ আপাই নিয়ে যাস! টিম্মিকে তোর সাথে নিয়ে ঘুমাতে দিবো। তোর পছন্দের কদম ফুলের পেইন্টিংটাও তোকে গিফট দিয়ে দিবো। আপাইইইইইইই! অ্যাঁঅ্যাঁঅ্যাঁ...

শোভা একবার পেছনে তাকিয়ে দেখে, মেজু দু-হাত বাড়িয়ে অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সে ঠোঁট বাঁকিয়ে ‘হুহ’ বলে চলে গেল রুমে। নোভা

টিম্মিকে নিয়ে শুলেও কোনো লাভ নেই। প্রতি রাতেই বিল্লুটা উঠে শোভার কাছে চলে আসে। হাজার চেষ্টা করেও নোভা ওকে আটকাতে পারে না—খামচে কামড়ে একেবারে ম্যাসাকার অবস্থা। তিন বোন মিলে বাচ্চাকালেই ভ্যাকসিন করিয়ে আনায় অবশ্য রক্ষা। এই পাওয়া জিনিসের জন্য আবার মেজুকে ভার্সিটিতে নিয়ে হিমশিম খাবে কেন? কাল যে অধিকার তারই ছিল—আজ তাকে নতুন করে আদায়ের চেষ্টা নিশ্চয়তা দেওয়ার বদলে বরং পুরোনো দাবিকেই দুর্বল করে। শোভা কি এতই বোকা? হুহ!

২

হঠাৎ করেই মোবাইলে মেসেজটা এলো—হলে সিট বরাদ্দ হয়েছে। বেলা এগারোটায় এই নোটিশ দেখে আনিকার মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত—ওর তো কোনো প্রস্তুতিই নেই! সে ভেবেছিল আগামীকাল নোটিশ আসবে, পরশু হলে উঠতে হবে। ওর প্ল্যান ছিল, আজ রাতের মধ্যেই সব গুছিয়ে ফেলবে। কিন্তু দশটার ট্রেন পাঁচটায় চলে এসে হুইসেল দিচ্ছে, মিস করলেই অন্য কেউ সিট দখল করে নেবে। অগত্যা চট করে ব্যাগ গুছিয়ে, কাঁদতে কাঁদতে আম্মাকে বিদায় দিয়ে, বিসমিল্লাহ বলে আব্বার সাথে বাসে ঢাকা রওনা হয়ে পড়ল আনিকা।

ঢাকা যাত্রার পুরোটা পথ আনিকা উত্তেজনায় ঘামছিল। ইশশ! এই প্রথম সে আব্বা-আম্মাকে ছেড়ে বাড়ির বাইরে থাকবে। গোটা জীবনটা তার কেটেছে এই আলুটিলা পাহাড়ের পাশে। আব্বা আর আম্মাকে ছাড়া একা থাকার সুযোগ সে কখনোই পায়নি। আর এক্ষণে নিজের গ্রাম, পরিবার ছেড়ে দেশের একপ্রান্ত থেকে একেবারে রাজধানীতে! আব্বা-আম্মা, ওদের টিনের বাড়িটা, বাড়ির সামনের বিশাল উঠান, উঠানের কোনায় কাঁঠাল আর কাঁচামিঠা আমগাছটা, বাড়ির পেছনের জঙ্গল, জঙ্গলের বুনো ফুলের সুবাস আর মায়াময় রূপ, উত্তর-পূর্বের পাহাড়ি বনটা, প্রায়ই বনের ধারে এসে সিক্ত, মায়াবী চোখে তাকিয়ে থাকা দলছুট হরিণগুলো, দুষ্টের শিরোমণি ছোটভাই অনিক, বিবাহিতা বড় বোন সালমা-বু, পাড়ার সেহেলিরা—সবকিছুই ওর খুব আপন মনে হচ্ছিল। আজন্মের সেই সম্পর্কের শেকড় ছিঁড়ে আজ সে চলে যাচ্ছে বহুদূর।

বছরের পর বছর যে ছোট চারা গাছটায় বাবা-মা বেড়ার কাজ করেছেন, সার-পানি